দেশেদেশে জয়যাত্রা

শিবপ্রসাদ রায়

দেশেদেশে জয়যাত্রা

শিবপ্রসাদ রায়

প্রাপ্তিস্থান
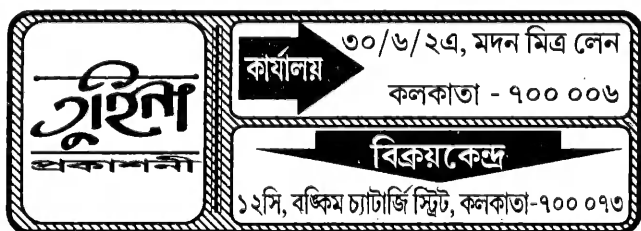
প্রকাশক ঃ
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া, ১৪১৫

মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস অ্যান্ড বাইন্ডিং
৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ ৪.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশে বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

দেশে দেশে জয়যাত্রা

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ নিজেদের পুরানো ধর্মীয় মতবাদের অন্তঃসারশূন্যতা এবং রাজনৈতিক দর্শনের ব্যর্থতা অনুভব করতে পেরেছে। ভোগক্লান্ত দেশগুলিও আত্মিক দিক থেকে অতৃপ্ত উপবাসী। তাদের অন্বিষ্ট মনে আগ্রহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে গৃহীত হচ্ছে সনাতন হিন্দুধর্ম। স্পেনের রাণী, রাজা কার্লোসের স্ত্রী, গ্রীসের রাজা কনস্টানটাইনের বোন রাণী সোফিয়া দীক্ষা নিলেন কাঞ্চি কামকোটির শঙ্করাচার্য্যের কাছে। হিন্দু পদ্ধতিতে তিনি এখন নিত্য জপ করছেন। রাণী সোফিয়ার ব্যক্তিগত আগ্রহে ইউরোপের সাধারণ বাজারে গোহত্যা প্রায় নিষিদ্ধ। নেদারল্যান্ডের রাজমাতা জুলিয়ানা দীক্ষা নিলেন হিন্দুধর্মে। বৃটেনের যুবরাজ চার্লস এখন হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। ইউরোপের বহু রাজপরিবার এবং ব্যারণ স্যাক্সনদের মত সম্ভ্রান্ত মানুষ ব্যক্তি জীবনের শান্তি ও গভীরতার জন্য ভারতীয় সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে নতজানু হচ্ছেন। লন্ডনের প্রায় তিন লক্ষ স্কুল ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক পাঠ্যসূচী রামায়ণ। হিন্দু জীবনধারা, তাদের মূল্যবোধ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে আত্মস্থ করার জন্য লন্ডনের বিদ্যালয়গুলিতে রামায়ণকে ধর্মশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে দেশের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে স্কুলে রামায়ণ কাহিনীর ওপর নাটক করে। শুচিতা, পবিত্রতায় মন্ডিত আদর্শ গৃহবধূ সীতা, তেজস্বী বীর আদর্শনিষ্ঠ রাম, সাহসী ভাই লক্ষণ, ভক্ত সেবক বীর হনুমান প্রভৃতি চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষ। হাজারে হাজারে ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে বিক্রী হচ্ছে রামায়ণ। শাড়ী পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বৃটেনের মেয়েদের। রামায়ণ সিরিয়াল হওয়ার পর রাস্তাঘাটে মেমরা সীতার অনুকরণে শাড়ী পড়ে কপালে

বিন্দিয়া লাগিয়ে বেড়াতে বেরোয়। লন্ডনে 'ইলিয়া' নামক একটি শিক্ষা সংস্থা স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা চালু করেছে ১৯৮৪ সাল থেকে। তারমধ্যে রামায়ণ অন্তর্ভুক্ত হয়। রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে ঘিরে যে আদর্শ পরিবারের মাধুর্য্যময় রূপ তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিত্য বর্ণিত হচ্ছে। ইলিয়া জানিয়েছে যে রামায়ণের আদর্শে ভবিষ্যতের নাগরিকদের উজ্জীবিত করতে তাদের এই শিক্ষাদান। ইউরোপে যুক্তিবাদী মানুষের কাছে হিন্দুধর্মকে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ এবং ওয়েভ মেকানিকসের আবিষ্কর্তা আরউইন স্রুডিঞ্জার সাহেবের ভূমিকা অনবদ্য। খৃষ্টধর্মের লোক হয়েও তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ১৯৮৫ সালে আমেরিকায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট রেগন সেখানে বার্তা পাঠিয়েছিলেন এই বলে ঃ বৈচিত্র্যই হচ্ছে মার্কিন জীবনের ধারা। আমাদের জাতির শক্তির ভিত্তিও সেটাই। হিন্দুধর্ম প্রচারে আপনাদের এই প্রয়াস সেই বৈচিত্র্যকেই পুষ্ট করছে। আমাদের জাতির অব্যাহত অগ্রগতিতে আপনাদের জনগণ ও তাদের বংশধরদের অতুলনীয় অবদানের জন্য আপনারা গর্ববোধ করতে পারেন। হিন্দুদের সম্পর্কে এই হচ্ছে মার্কিনী জনগণের মনোভাব।

মধ্যপ্রাচ্যে কোনকালে শান্তি ছিল না, আজও নেই। এর কারণ অনুসন্ধান করতে এগিয়ে এলেন লেবাননের প্রথম প্রেসিডেন্ট কেমাল জামব্ল্যাট। ক্রমাগত জলের উৎস অনুসন্ধানকারী যেমন একদিন সাগরে গিয়ে পৌঁছবে, তেমনি ধর্মীয় সত্যের অন্বেষণকারীদের পৌঁছতেই হয় হিন্দুধর্মে। কেমাল জামব্ল্যাট ভারতে এলেন, বেলুড় ঘুরে গেলেন। নতুন প্রেরণা নিয়ে গেলেন, লেবাননে শান্তি ফেরানোর জন্য। তাঁর ঘরে থাকতো ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবি। অশান্ত ধর্মের লোকেরা তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করল। লেবানন আজও অগ্নিময়—মৃত্যু, হত্যা নিত্যদিনের সঙ্গী।

১৯৮৭ সালে রাশিয়ার অর্থোডিক্স চার্চের আয়োজনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৮১ টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজ। এই সম্মেলনে রুশ নেতারা স্বীকার করেন বিশ্ব জুড়ে ভয়াবহ পরমাণু যুদ্ধের পটভূমিতে রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের বাণী বিশ্বকে শান্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা আবেদন জানান রাশিয়ায় হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী চাই। মিশনের বহু সন্ন্যাসী রাশিয়া যাবার আগে রুশ ভাষা শিখে নিচ্ছেন। রুশ সরকার পাঁচ একর জমি দিয়েছেন। সেখানে বেদান্ত অডিটোরিয়াম খোলা হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু মানুষ সব ধর্ম সমান বলে একধরণের গোলমাল পাকিয়ে তোলেন। পৃথিবীর মানুষ বুজরুকি চায় না, ভেজাল চায় না—সত্য চায়। তাই ১৯৮৮ সালে রাশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী কলকাতা এসে সোজা চলে গেলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের কার্য্যালয়ে। দীর্ঘ আলোচনা করে বহু গ্রন্থ নিয়ে গেলেন, সন্ন্যাসীর আবেদন জানিয়ে গেলেন। ১৯৮৯ সালে রাশিয়ায় গেলেন এক সন্ন্যাসী, নাম পরমানন্দ ভারতী। তাঁর একটি অনুষ্ঠান হলো ক্রেমলিন প্রাসাদে। লেনিন মূর্ত্তির নীচে। প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটি সদস্য এবং আরও দুহাজার রুশ ডিগনিটারিজ সেখানে উপস্থিত। ছিলেন— বিজ্ঞানী, ধর্মযাজক, গণিতজ্ঞ, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, কবি, সমরবিশেষজ্ঞ। তাদের সকলকে ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ এবং বৈদিক স্তোত্র পাঠ করিয়ে পরমানন্দ ভারতী অনুষ্ঠান শুরু করলেন। বাহুবলে, অর্থবলে প্রচারিত ধর্মের নামে অধর্মগুলি আজ ম্রিয়মান। দেশে দেশে জয়যাত্রা শধু হিন্দুধর্মের। এটা একটা আকস্মিক হুজুগ নয়, অনেকদিনের অনেক ত্যাগ ও সাধনার পরিণতি। হিন্দুধর্ম তার ত্যাগ তিতিক্ষা পবিত্রতা তপঃশক্তির জোরে একদিন সারা পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছিল।

এর প্রবক্তারা ভেবেছিলেন আমাদের বিচার অর্থাৎ দর্শন চরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা আচারনিষ্ঠ। আমাদের দেখে বাকী মানুষ শিখে নেবে, তাই আমাদের ধর্মের প্রচার নিষ্প্রয়োজন। এজন্যই প্রচারে হিন্দুধর্ম কোনদিন বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। তখন পৃথিবীতে আক্রমণাত্মক প্রচারধর্মী কোন মতবাদও মাথাচাড়া দেয়নি, ফলে অসুবিধা ছিল না। পরবর্তীকালে যেগুলো ধর্ম নয়—নিম্নমানের ব্যক্তিদের মাথা থেকে বের হওয়া মতবাদগুলো নিজেদের ধর্ম বলে জগৎজুড়ে দাপাদাপি শুরু করে দিল।

কপটদের প্রচন্ড দাপটে সত্যধর্ম কোণঠাসা হয়ে গেল। একালে প্রথম বিদেশে যিনি প্রচারের জানালা খুলে দিলেন, তিনি বিবেকানন্দ। মৃতপ্রায় হিন্দুধর্মে তিনি প্রাণসঞ্চার করলেন। বিদেশে পরবর্তীকালে অসংখ্য মানুষ হিন্দুধর্মের বৃক্ষে জলসিঞ্চন করেছেন। তারমধ্যে উল্লেখ করার মত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মহেশ যোগী প্রভৃতি। আর এখন অপ্রকট হয়েও যিনি সর্বাধিক প্রকট সেই ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা এ. সি. ভক্তিবেদান্ততীর্থ মহারাজ। তাঁর কথা কিছু জানার প্রয়োজন আছে। কলকাতার এক ব্যবসায়ীর সন্তান অভয়চরণ দে। বাবা গৌরমোহন দে'র ইচ্ছা ছিল অভয় বড় হয়ে একজন ভালো কীর্তনীয়া হোক্। তাই তিনি ছেলেকে নিষ্ঠা সহকারে মৃদঙ্গ বাজানো শেখাতেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় অভয়ের সহপাঠী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে অভয়চরণ ভাগবত ও গীতার টীকা ভাষ্য রচনায় মনোযোগ দিলেন। ধর্মে গভীরতা এবং জীবনীশক্তি থাকলে একটি মানুষ কি অবাক করা কর্মকান্ড ছড়িয়ে দিতে পারেন সারা বিশ্বে তার জ্বলন্ত উদাহরণ—অভয়চরণ। ১৯৪৪ সালে তিনি নিজের চেষ্টায় "ব্যাক টু গড হেড্" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন পর্য্যন্ত তিনি এলাহাবাদে।

ওখানে তাঁর একটি ওষুধের দোকান ছিল। দে এন্ড সন্স। 'ব্যাক টু গড হেড্' পত্রিকার পান্ডুলিপি টাইপ করা, প্রুফ দেখা, সম্পাদনা এবং বিতরণ, সব তিনি একা করতেন। পত্রিকা পাঠাতেন ভারতের তাবৎ বিদ্বজ্জনের কাছে এবং বিদেশের পন্ডিতদের কাছেও। তাঁর পান্ডিত্য বহু বিদ্বানকে মুগ্ধ করে। ১৯৪৭ সালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধি প্রদান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি এলাহাবাদ থেকে ঝাঁসীতে বেদান্ত সংস্কৃত কলেজে বৈষ্ণব ধর্মের উপর বক্তৃতা করতে গেলেন। তাঁর বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রভাকর মিশ্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ডঃ মিশ্রের আগ্রহে তিনি ঝাঁসীতে একটি ভক্ত সংঘ গড়ে তোলেন। এই সংঘই পরিবর্তীকালে ইস্কন হয়। ১৯৫৪ সালে তিনি সংসার ত্যাগ করে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনে তাঁর স্থিতি হয়। এই সময় তিনি গভীরভাবে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন।

১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন এবং বৃন্দাবনে "রাধা দামোদর" মন্দিরে বাস করতে থাকেন। তখন তাঁর বয়স ৬৩ বছর। ১৯৬৫ সালে ৬৯ বছরের এই বৈষ্ণব—ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন আমেরিকা। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের সেক্রেটারী সুমতি মোরারজীর আনুকূল্যে জলদূত নামে মালবাহী জাহাজে পেলেন একটি বিনামূল্যের টিকিট। আর সঙ্গে ছিল মাত্র আট ডলার, যার তখন ভারতীয় মূল্য চল্লিশ টাকা। মথুরার একব্যক্তির ছেলে থাকত নিউইয়র্কে। সে তার পিতার অনুরোধে একটি স্পনসর পাঠিয়েছিল। ফলে অভয়চরণ আমেরিকা পৌঁছে নিউইয়র্কে এই যুবকের বাড়ীতেই থাকতেন। সামান্য নিরামিষ রান্না তিনি নিজেই করে নিতেন। ভক্তিবেদান্ত যখন আমেরিকা গেলেন তখন সেখানকার সামাজিক জীবন আচ্ছন্ন হতাশা আর উচ্ছৃঙ্খলতায়। কোকেন, এল. এস. ডি, চরস, হেরোইন, মারিজুয়ানার

মত তীব্র মাদকে আর বিকৃত বীভৎস যৌনাচারে ডুবে যাচ্ছে আমেরিকার সমাজ। আর একদল শান্তির সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে—হিপি বলে যারা পরিচিত। ভক্তিবেদান্তস্বামী হিপি দুনিয়ার হেড কোয়ার্টার টম্পকিন স্কোয়ার পার্কে প্রত্যেক দিন বিকেলে মৃদঙ্গ বাজিয়ে হরেকৃষ্ণ নামগান করতে লাগলেন। গৈরিক বসন পরিহিত প্রবীণ সন্ন্যাসীর সুরের আকষর্ণে এলো হিপি তরুণ তরুনীরা। আসতেই থাকল, অনেক জিজ্ঞাসা নিয়ে। যুক্তিবাদী আমেরিকানরা অজানাকে জানতে চায়। প্রতিদিন কীর্তন শেষে শূরু হয় বৈদিক শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা, কখনও গান।

প্রভুপাদ মাতৃভাষার মতই অনর্গল বলতে পারতেন ইংরেজী ও সংস্কৃত। আর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত জানতেন অপূর্ব। ক্রমশঃ হিপি অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় নিউইয়র্কে এক পরিত্যক্ত দোকান ঘরে তৈরী হলো প্রথম ইস্কনের "রাধা কৃষ্ণ মন্দির"। প্রভুপাদ বিগ্রহ স্থাপন করলেন। দীক্ষা দিলেন শিষ্যদের, বৈষ্ণব পদ্ধতি পরম্পরা অনুযায়ী নিয়ম বেঁধে দিলেন। বৈষ্ণব যে দেশেরই হোক্ চলবে না আমিষ আহার, নেশা, অবৈধ যৌনাচার আর জুয়া। জীবনকে সংযত করতে হবে। প্রথমদিকে এইসব নিয়মকানুন তাঁর শিষ্যরা মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না, আবার প্রভুপাদের দুর্বার আকর্ষণও কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। আমেরিকার মত একটি দেশে যেখানে অবাধ যৌনাচার, মাদক আর আমিষ আহারে মানুষ অভ্যস্ত সেখানে শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিশাস্ত্র লোকে মানবে কেন? আশ্চর্য্যের কথা এর জন্য প্রভুপাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের হয়ে গেল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি আমেরিকার জনগণকে বিপথে পরিচালিত করছেন তাঁর নিজস্ব দর্শনের দ্বারা। আদালত তাঁকে লিখিতভাবে কারণ দর্শাতে বললেন। প্রভূপাদ লিখিত স্টেটমেন্ট হিসাবে তাঁর নিজের লেখা ভাগবতের ভাষ্যগুলি পেশ করলেন। বললেন,

জড় মায়াচ্ছন্ন মানুষ যদি প্রকাশ্যে মদ্য মাংস নারীদেহের বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে মোহগ্রস্ত করতে পারে, তাহলে আমিই বা মানুষকে ভারতীয় দর্শন গ্রন্থের প্রচারের মাধ্যমে ভক্তিমার্গে টেনে আনতে পারব না কেন? আদালত তাঁর লেখা ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করে যে রায় দিলেন তাতে মামলা খারিজ হয়ে গেল। এ নিয়ে কাগজপত্রে যথেষ্ট সোরগোল হয়ে গেল। ফলে এবার দলে দলে এগিয়ে এলো মেয়েরা। এত স্নিগ্ধ মধুর, পবিত্র জীবনের কথা এর আগে তারা শোনেইনি। তাদের অভিযোগ ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ কি শুধু পুরুষদের জন্য? আমদের জন্য নয়? আমরাও এই কুরুচিকর জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাই, আমাদের দীক্ষা দিন। পূর্ববর্তী আচার্য্যরা যা করেননি তিনি তাই করলেন, মেয়েদের দীক্ষা দিতে শুরু করলেন, তাঁর বক্তব্য স্মৃতির সংবিধান মানুষের জন্য। মানুষের প্রয়োজনে নিয়মের বাঁধন বদলাতে পারে। মার্কিন সমাজ মনে মনে ইস্কনকে স্বাগত জানাল। কারণ, যেভাবে যুবশক্তি অপচয় হচ্ছিল তা থেকে অন্ততঃ বাঁচবার একটা রাস্তা তারা দেখতে পেয়েছে। মার্কিন সরকার বা অন্যান্য দেশের গভর্ণমেন্ট কিন্তু হিন্দুধর্মের অগ্রগতিকে খুব ভালো চোখে দেখে না।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত আর মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিটি,দুটোই নেদারল্যান্ডের হেগ আর ইউট্রেকর্ট্ শহরে অবস্থিত। বিশ্বের বহু জটিল আন্তর্জাতিক বিবাদগুলির নিষ্পত্তি হয় এই আদালতে। এদের নিয়োজিত একটি কমিটি চার বছর ধরে ইস্কন সম্বন্ধে তদন্ত করে ৩২০ পাতার একটা রিপোর্ট দিয়েছে। তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের যে ছবিটি আমরা দেখতে পেয়েছি তা হলো এটি একটি বিশুদ্ধ এবং খাঁটি বৈদিক আন্দোলন। পশ্চিমী ধারণার সঙ্গে কোনরকম আপোষ এখানে করা হয়নি। প্রথম দিকে এই আন্দোলন

হিপিদের একটা ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে এদের ভাবমূর্ত্তি ছিল ভিন্ন। পত্রপত্রিকাগুলি পৃথিবী জুড়ে বাস্তবকে বিকৃত করে তুলে ধরেছে। এটা বিশুদ্ধ বৈদিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। এটা যদি আমাদের কৃষ্ণ চেতনাকে বিস্তৃত নাও করে তবুও এই আন্দোলন সম্পর্কে অন্ধকারাচ্ছন্ন ধারণার অবসান ঘটেছে বলতে হবে।”

ক্যাসিয়াস ক্লে যিনি অতি উৎসাহে ইসলাম গ্রহণ করে মহম্মদ আলি নাম নিয়েছিলেন, তাঁর ক্রমেই ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ কমছে, উৎসাহ বাড়ছে হিন্দুধর্মের প্রতি। কলকাতায় এসে তিনি কালীঘাটে কালীমূর্ত্তি দর্শন করতে গিয়েছিলেন যা ঘোরতর ইসলাম বিরোধী। তিনি কিছুকাল আগে নাইজিরিয়ার লেগোস শহরে একটা আফ্রিকান সঙ্গীত অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। তিনি ইস্কনের ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। লেগোসের ইকোয়ি হোটেলে তিনি ভাষণে বলেন—বিশ্বজুড়ে মায়াচ্ছন্ন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইস্কনের প্রয়োজন জরুরী! বছর কয়েক আগে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে ১৩৫ টি দেশের ৪৫০০ প্রতিনিধি মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে মিলিত হয়েছিলেন—এই বৈঠক হ্যাবিটাট নামে পরিচিত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইতিহাসে সরকারী এবং বেসরকারী মানব কল্যাণমূলক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এধরণের বৈঠক এই প্রথম। এই বৈঠকে ইস্কন আমন্ত্রিত হয় এবং কৃষ্ণভক্তদের বক্তব্য মর্য্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়। ইউরোপ আমেরিকায় এখন আর একটা শহরও নেই যেখানে ইস্কনের মন্দির অথবা ভক্ত নেই। উচ্চ শিক্ষিত মানুষ কম আছেন যিনি “ভগবদ্‌গীতা এ্যাজ ইট ইজ” বইটি পড়েননি। এই ভারতে বহু বাড়ীতে গীতা আছে—কেউ পড়ে না, কিন্তু ভক্তিভরে ফুল, ফল, জল দেয় রোজ। ফলে অচিরে ফুলে ফেঁপে ওঠে।

গৃহস্বামী মারা গেলে গীতাটি তার সঙ্গে চিতায় দিয়ে দেওয়া হয়। মহা তমোগুণের এটাই বৈশিষ্ট্য না পড়েই সব জানা। ইউরোপ আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রচার প্রসার যে কতভাবে আর কত স্থানে চলছে তা বলা অসম্ভব। বর্ত্তমানে সানফ্রান্সিস্কোয়, লস এঞ্জেলসে রথযাত্রা, ফ্রাঙ্কফুর্ট কিম্বা বার্লিনে দোলপূর্ণিমা, দানিউব কিম্বা টেমস নদীতে নৌকাবিলাস, লন্ডন কিম্বা ব্রুসেলসে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন এখন অত্যন্ত সহজলভ্য দৃশ্য।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ইংলন্ডের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেকথা লন্ডনে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান স্বামী ভব্যানন্দ বলেছেন। একশো বছর আগে যখন বিবেকানন্দ এখানে এসেছিলেন, ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাননি। এখন আর্চবিশপ আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যায়। বাকিংহাম শায়ারের আশ্রমে লন্ডনের রয়েল ফ্যামিলীর মেম্বারেরা দীক্ষা নেয়। মন্ত্র, জপ, কীর্তনের একটা ক্রেজ এসে গেছে এখন বৃটেনে। আর বেদান্তের চর্চা তো আছেই। অনেকেরই জানা নেই দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি—ক্রিস্টোফার ইশারউড এবং আলডুস হাক্সলী শেষ পর্য্যন্ত বেদান্ত গ্রহণ করেছিলেন। জেনেভা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান নিত্যবোধানন্দ ওখানে দারুণভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর কাজের প্রতিক্রিয়া পৌঁছে গেছে প্যারিসে। ফ্রান্সের সোরবোর্ণ ইউনিভাসিটি তাঁকে মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানায়— ধর্ম ও দর্শনের ওপর ভাষণ দেবার জন্য। হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও জার্মানীতে অনেক সন্ন্যাসী নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। মহেশ যোগীও কম কাজে লাগছেন না। তিনিও বিশ্বের বহু জায়গায় বহু মানুষকে বিভ্রান্তির পথ থেকে হিন্দুত্বের দিকে ফিরিয়ে এনেছেন। এইসব দেশে মানুষ যেন একটা বড় কিছুর জন্যে ওৎ পেতে ছিল। তাই হিন্দুধর্মের প্রচারে ইউরোপ, আমেরিকাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সামান্য বাধা

এসেছে বাধা অতিক্রমও করেছে। তাই এদিকের কাজে এ্যাডভেঞ্চার থাকলেও নাটকীয়তা নেই। সংঘর্ষ, অত্যাচার, বাধা এসেছে কিছু ইউরোপ, কিছু এশিয়ার অন্তর্গত একটি রাষ্ট্রে তার নাম—রাশিয়া। এখন তারা ডাকাডাকি করছে, সন্ন্যাসী চাইছে, ঠিক কথা। কিন্তু মাত্র কটা বছর আগেও রাশিয়াতে কৃষ্ণনাম কংস রাজ্যের মতই বিপজ্জনক ছিল। ছিল বলা হচ্ছে এইজন্য গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রৈকার কল্যাণে সোভিয়েত দেশে এখন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। সোভিয়েত সংবিধানে কোন ধর্মাচরণে বাধা না থাকলেও ১৯৮৮র আগে পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তদের পুলিশ ছেড়ে কথা বলেনি। প্রকাশ্য রাজপথে সঙ্কীর্তন দূর অস্ত্ নিজের বাড়ীতে ভজন-পূজনের আয়োজন করলেই পুলিশের অবাঞ্ছিত আবির্ভাব ঘটেছে। শতশত কৃষ্ণপ্রেমী গ্রেপ্তার হয়েছেন—জেল, শ্রমশিবির, মানসিক হাসপাতালে কেটেছে মাসের পর মাস, অবর্ণনীয় কষ্টে। কৃষ্ণভাবনা রাশিয়ায় প্রবিষ্ট হয়েছে ১৯৭১ সালে। এইসময় ভক্তিবেদান্ত মস্কোয় যান অধ্যাপক জি. জি. কোতাভস্কির আমন্ত্রণে। সেদিন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বক্তা এক, শ্রোতাও একজন, প্রায় কুরুক্ষেত্রের দৃশ্য—বক্তা কৃষ্ণ শ্রোতা অর্জ্জুন। এখানে বক্তা প্রভুপাদ আর শ্রোতা অধ্যাপক কোতোভস্কি। এ্যাকাডেমীর বুদ্ধিজীবিদের সামনে একটা বক্তৃতা করার কথা তুলেছিলেন প্রভুপাদ। আতঙ্কে তা নাকচ করে দেন কোতোভস্কি। এরপর অভয়চরণের সঙ্গে দেখা হয় আনাতোলি পিনাইয়েভের। যিনি দশ বছর ধরে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মস্কোয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। ধর্ম যে দেশে আফিম, সেই দেশে ১৯৭৯ সালে হু হু করে বিক্রী হয়েছে রুশ ভাষায় অনূদিত গীতা এবং ভক্তিবেদান্তের বইগুলি। প্রশাসনের খড়্গ নেমে এলো ১৯৮০ সালে।

লাটাভিয়ার রাজধানী রিগায় কৃষ্ণপ্রেমীদের এক বিশাল জনতা কীর্তনে মাতোয়ারা। অবাঞ্ছিতভাবে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল কে. জি. বি. এবং

পুলিশ। অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। ঠাঁই হলো তাদের জেল, শ্রমশিবির এবং মানসিক হাসপাতালে। আনাতোলি পিনাইয়েভকে চারবছর মানসিক হাসপাতালে রাখার পর তাঁর স্ত্রী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ আর কতদিন আমার স্বামীর চিকিৎসা চলবে? ডাক্তার জবাব দিলেনঃ জীবন এবং বাস্তবতা সম্পর্কে কারো ধারণা বদলাতে কিছু সময় তো লাগবেই। জগত সম্পর্কে আনাতোলির ধারণাটাই একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। ভ্লাদিমির জর্জিভিচ ক্রিৎসকি কমিম্পউটার ফিজিক্সের স্নাতক, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখন নাম বিশ্বামিত্র দাস। তিনি কোলকাতায় এসে জানিয়ে গেলেন হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে ধৃত শেষ মানুষটি ছাড়া পেয়েছেন '৮৮র ডিসেম্বরে। এখন সোভিয়েত দেশে ভজন-পূজন তো ছাড় এমনকি খোল কত্তাল সমেত নগর সংকীর্ত্তনেও প্রশাসনের তরফে কোন বাধা নেই। মস্কো-লেনিনগ্রাদ-রিগা -তাসখন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের শহরে শহরে ছড়িয়ে পড়ছে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের তরঙ্গ। খোদ মস্কোয় হয়েছে দুটি ভারতীয় রেস্তোঁরা। সেখানে নিরামিষ আহার এবং প্রসাদ তৈরীর উপকরণ মেলে। মস্কোয় রুভলোভস্কোয়ে ষ্ট্রীটে আছে বোম্বে রেস্তোঁরা। মেট্রো ষ্টেশনের কাছে আছে ক্রিয়োৎসকায়া। লেনিনগ্রাদে তৈরী হয়েছে সমবায় কাফে যার নাম সঙ্কীর্তন। সলিয়াস লেকিনোভিচ দাগিসের বাড়ী লিথুয়ানিয়ায়। লিথুয়ানিয়া ভাষা থেকে ইরেজীতে অনুবাদ করাই তার পেশা। এখন তার নাম সনৎকুমার দাস। তিনি জানালেন ঃ ভূমিকম্প বিধ্বস্ত আর্মেনিয়ার মানুষকে খাওয়াবার জন্য আমরা একটা কাফে খুলেছি। খুব শীগগির মস্কোতে একটি সঙ্কীর্তন কাফে খুলছি। ভ্যালেন্তিনা পিত্রোভনা সামাইলোভার নাম এখন পূর্ণমালাদেবী দাসী। কিন্ডারগার্টেনের এই শিক্ষিকা খুশীর সঙ্গে জানালেন ঃ এবার মস্কোতে তৈরী হবে ইস্কনের মন্দির। জমি খোঁজা হচ্ছে। এখন একটা

বাড়ীতে মন্দিরের কাজকর্ম চালানো হচ্ছে, নামসঙ্কীর্তনে অসুবিধা হয়। ভক্তদের এ্যাপার্টমেন্টে একসঙ্গে অনেকের জায়গা হয় না। আলেক্সেই এ মিহিভ এখন কৃষ্ণকৌমার দাস। তিনি জানালেন সোভিয়েত্ দেশে এখন একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে গবেষণা চলছে—তা হলো আত্মা এবং মৃত্যুর পরে জীবনের অস্তিত্ব। খুব গোপনে অ্যাকাডেমিশয়ান আলেকজান্ডার স্পিরকিনের নেতৃত্বে গবেষণা চলছে।

গবেষণার রিপোর্ট অত্যন্ত বিতর্কিত হওয়ায় ব্যাপক অনুসন্ধানের স্বার্থে গবেষণা গোপন রাখতে হয়েছে। এঁরা ৫৯ জন কৃষ্ণভক্ত রাশিয়া থেকে এসেছিলেন— শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি দর্শন করতে, প্রভুপাদের জন্মস্থান কলকাতা দর্শন করতে। কলকাতায় তাঁরা একটা কাজ করে গেলেন— মহাপাপী লেনিনের মূর্ত্তির চারপাশে উদ্দাম কীর্তন করেছেন। তাঁর উদ্ধারের জন্য। কিন্তু মার্কসবাদ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাঁরা হেসে এড়িয়ে গেলেন। বললেন আমরা রাজনীতিক নই কৃষ্ণভক্ত মাত্র। আমরা অনেক ধর্ম-দর্শন পড়েছি, জেনেছি, শেষ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে এসে ঠেকে গেছি। ধর্মকে আমাদের আফিম বলে মনে হয়নি। আমাদের কাছে কৃষ্ণই শেষ কথা। আমরা ধূমপান করি না, মদ খাই না, আমিষ আহার করি না, অতি দীনভাবে দিনাতিপাত করি। বিশাল সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এঁরা এসেছিলেন। সকলের ধর্ম এক ছিল না, ভাষাতেও দূরত্ব ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন—চিত্রকর, অনুবাদক, লেখিকা, শল্য চিকিৎসক, ছাত্র, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, শিশু বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, শ্রমিক, সাইবারটিক্সের অধ্যাপক, শিক্ষিকা, পদার্থবিদসহ বহু বিচিত্র পেশার মানুষ। আর্থিক সঙ্গতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধিবৃত্তিতে কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়। স্বচ্ছল ভোগবাদী জীবন পরিত্যাগ করে এই কৃষ্ণভক্তরা কেন দুঃখের

সংযমের পথ বেছে নিলেন? সবাই জানালেন গীতার দর্শনই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বাণী এবং প্রভুপাদের আদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত।

ক্রিৎসকি কিমিলোভা, ইয়েভ, ফেদচেনকা, প্রিবোরেভ, সাইমালোভা সহস্র পদবী আর নাম মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে দাস আর দাসীর সমুদ্রে! এক লাইনে বসে প্রসাদ গ্রহণ করছে নিরামিষ—ইউক্রেন, আজারবাইজান, জর্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, আর্মেনিয়া আর রাশিয়ার মানুষ। সবাইকে এক করে দিয়েছে একাকার করে দিয়েছে —কৃষ্ণনাম-হিন্দুদর্শন। দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তে এঁরা তৈরী করে যাচ্ছেন ভিন্ন ধরণের ইতিহাস।

এবার একটি ভিন্ন ধরণের ঘটনায় আসা যাক—ঘটনাটি প্রেম ভালবাসার। প্রেমিক বেদব্যাস দাস, প্রেমিকা মিত্রাবিন্দাদেবী দাসী। পূর্ব নাম ভ্যালেন্তিন জেলমানোভিচ আর মেরী অ্যান ফারো। মস্কোর মানসিক হাসপাতালে আটক বেদব্যাসকে মুক্ত করার জন্য মিত্রাবিন্দা ২১ দিন অনশন করেছেন স্টকহোমের রুশ দূতাবাসের সামনে। তাঁর পরণে ছিল বিয়ের গাউন। ১৯৭৯ সালে মস্কোয় আন্তর্জাতিক বইমেলায় ডেভিড জাকুপাতো বা কীর্তিরাজ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপর থেকেই ভ্যালেন্তিন ইস্কনের সক্রিয় সদস্য। ১৯৮৩তে তার এ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলো কে. জি. বি.। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হলো আদালতে। মেরী অ্যানের মঙ্গে ভ্যালেন্তিনের পরিচয় দীর্ঘদিনের। মেরী যখন মস্কোগামী ট্রেনে চড়ে ভ্যালোন্তিনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তখন হেলসিঙ্কিতে তাকে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হলো। ট্রেন কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল মেরীর মস্কো যাবার অনুমতি নেই। সুইডেনে ফিরে মেরী দেখা করল স্ক্যান সোভ ট্রাভেল এজেন্সী এবং সোভিয়েত কনসাল জেনারেলের সঙ্গে। তাঁরা জানালেন মস্কোর নির্দ্দেশে মেরীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। ভ্যালেন্তিনের অবস্থা ওদিকে শোচনীয়। এ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে

তাকে নিয়ে গেছে মস্কোর গানুশকিন সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল। ডাক্তারবাবু তাকে একটা রিপোর্ট পড়ে শোনালেন। ভ্যালেন্তিন তা থেকে জানতে পারল, সে কোন কাজ করে না, তার অ্যাপার্টমেন্টে নির্দ্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে না। পরবর্তী ২৩ দিন ভ্যালেন্তিনকে কাটাতে হয়েছে মাতাল-ড্রাগখোর অপরাধীদের সঙ্গে। এইসময় দিনে তিনবার হলুদ আর সবুজ রঙের ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছে। মেরী অ্যান সুইডেনে চুপচাপ বসে ছিলনা। ভ্যালেন্তিনের বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জেনেছে প্রেমিকের অবস্থা।

অ্যান একদিন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে সোভিয়েত দূতাবাসের সামনের রাস্তায় ডেকে বসল সাংবাদিক সম্মেলন। ঘোষণা করে দিল হাসপাতাল থেকে ভ্যালেন্তিনকে ছাড়া না হলে এবং মস্কোয় গিয়ে তাকে বিয়ে করার অনুমতি না দিলে সে অনশন করবে। বসেও গেল অনশনে। পরণে বিয়ের পোষাক, হাতে ভ্যালেন্তিনের বিশাল ফটো। পাশে লেখা ফ্রি ভ্যালেন্তিন মাই ফিঁয়াসে—আমার প্রেমিক ভ্যালেন্তিনকে মুক্তি দাও। কন্সাল জেনারেল রেগে গেলেন। মেরী অ্যানকে ডেকে কড়া মেজাজে বললেন ঃ দূতাবাসের বাইরে তুমি বাকী জীবনটা অনশন করে কাটাতে পারো। কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না। এদিকে মুক্তি পেয়ে গেছে ভ্যালেন্তিন। সরকারের দুই প্রতিনিধি তার সঙ্গে দেখা করে বললেন ঃ আগে তুমি মেরীকে অনশন প্রত্যাহার করতে বলো, তারপর আমরা তোমাকে সুইডেনে পাঠাবার চেষ্টা করব। মেরীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগযোগ করলো ভ্যালেন্তিন। কথাবার্তা বলে সিদ্ধান্ত নিলো সেও অনশন করবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুইডেনে যাবার আগে পর্য্যন্ত চলবে অনশন। ১৮ই আগষ্ট আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিদের ডাকলো, সেইসঙ্গে সুইডিশ দূতাবাসের অফিসারদের। তাদের সামনে শুরু হলা অনশন। ৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চলেছিল এই অনশন। ঐদিনই বিমানযোগে ভ্যালেন্তিন পৌঁছে গেল সুইডেন।

দেখা হলো অনশনক্লিষ্ট দুই প্রেমিক প্রেমিকার। কৃষ্ণপ্রেমের কারণে যাদের এত যন্ত্রণাভোগ।

রাশিয়ায় কৃষ্ণচেতনার প্রসারে প্রথম দিকে আরো মজার ঘটনা ঘটেছিল— স্ট্যালিনগ্রাদের একটি রাস্তায় দুজন কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণনাম করছে দেখে পুলিশ তাদের জেলে ঢুকিয়ে দেয়। তারা জেলের মধ্যেই হরেকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করে দেয়। যেসব জেল পুলিশ তাদের পাহারা দিচ্ছিল তারাও এদের সঙ্গে গলা এবং তাল মিলিয়ে কীর্তন করতে লাগল। সব শুনে জেলার রেগে আগুন। তিনি ছুটে এলেন বেয়াদপি দমন করতে। এসে দেখলেন বাঃ কি মনোহর পরিবেশ। একটি কৃষ্ণের ছবি, ধূপকাঠি জ্বলছে। পুলিশ, কয়েদী, কৃষ্ণভক্ত সবাই অপূর্ব সুরে নামগান করছে। জেলারের উত্তেজনা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলে, তিনিও ওদের মত দুলে দুলে কীর্তন করতে লাগলেন। মস্কোর একটি জেলে বেশ কিছু কৃষ্ণপ্রেমীকে আটকে রাখার একই ফল হয়েছিল। সব কয়েদী পুলিশ হরেকৃষ্ণ উচ্চারণে গোটা জেল ভরিয়ে তুলল। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তে এলেন এটি সংক্রামক মানসিক ব্যাধি। পাঁচজন মনোরোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাঠিয়ে দিলেন তাঁরা। কৃষ্ণনামের ব্যাধির মহামারী প্রতিরোধের জন্য। সমস্ত কীর্তনীয়াদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম ফ্রি এ্যাসোসিয়েশন। প্রত্যেকটি রোগীকে অকপটে নিজের সবকথা ডাক্তারকে বলতে হবে। পৃথক পৃথক ভাবে পাঁচজন ডাক্তার রোগীদের বক্তব্য শুনে গেলেন। শোনার প্রতিক্রিয়া হলো এই যে ডাক্তারেরা ফিরে গিয়ে প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়ীতে রাধকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন, পরে ইস্কনের নিষ্ঠাবান কর্মী হয়ে গেলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণনাম যেন যাদুর মত কাজ করে চলেছে। ঘটনা বলেই বিশ্বাস করতে হয়। নইলে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভারতবর্ষে মহা তমোগুণের প্রভাব চলছে। কাঠের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না, তেমনি কৃষ্ণচৈতন্যের তরঙ্গ খেলেনা তমো আচ্ছন্ন মানুষের হৃদয়ে। তাই তাদের মানসিকতায় এইসব ঘটনা সন্দেহ জাগায়। সবকিছুর মধ্যে ষড়যন্ত্র দেখে। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে মানুষ সকলের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। আত্মবিশ্বাস হারায় সর্বাগ্রে। এখন অবশ্য আবার নতুন করে বিশ্বাস ফিরছে। একজন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বঙ্গসন্তান, পরে অবশ্য সন্দেহ ভঞ্জন হয়েছে, এমন একব্যক্তির কলমে বা বকলমে এবার কিছু শোনা যাক্। সবকথাই তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঃ তখন আমি ছিলাম হল্যান্ডের আমস্টারডামে। হল্যান্ডে তখন সেক্স নিয়ে নরক সৃষ্টি হয়েছে। শহরে পথে পথে অনেক সেক্সশপ গজিয়ে উঠেছে। সেক্সশপ সেক্স সিনেমা সেক্স সিম্বল লোকের হালচাল মনে যখন খুব আলোড়ন এনেছিল, ঠিক তখন একদিন আমস্টারডামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম, প্রেমানন্দে গাওয়া একটি সঙ্কীর্তন গানের দল, পার্থসারথির মঙ্গল শঙ্খের মত। জনাকয় শ্বেতাঙ্গ যুবক দুহাত তুলে মহানন্দে নেচে গাইছিলেন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাস, দিনকয়েক আগে বালটিক্ অঞ্চলের পোল্যান্ডে বরফপাত হয়ে গেছে। হল্যান্ডে তখন বেশ শীত, কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। গেরুয়া ধুতি পড়ে, তুলসীর মালা গলায় দিয়ে, কপালে লম্বা তিলক এঁকে শিখাধারী মুন্ডিত মস্তক স্মিতহাস্য পাশ্চাত্য সন্ন্যাসীরা দিব্যভাবের আবেগে গেয়ে চলেছেন কৃষ্ণনাম।

মাসচারেক আগে কোলকাতার রাজপথে ছোট একটি কীর্তনীয়া দলের পুরোভাগে ধূতি পড়া শিখাধারী একটি সাহেবকে দেখে কৌতুকবোধ করেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম বুজরুকি। এবার ইউরোপের মাটিতে নিদারুণ আধুনিকতার মধ্যে, পাঁচশ বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচলিত

খোল করতাল বাদ্যের তালে তালে গাওয়া কৃষ্ণনাম শুনে মনে হলো ব্যাপারটা একটু যাচাই না করলেই নয়। সেদিন ছিল রবিবার—অনেকেই আমস্টারডামের শহরতলী ফ্রিজেনস্টেইনের মন্দিরে এসেছেন, আমারই মতো রাস্তায় শোনা কৃষ্ণনামের আকর্ষণে। মন্দির বলতে ছোট একটি নবনির্মিত ফ্ল্যাট। ফ্রিজেনস্টেইন মন্দিরের অধ্যক্ষ সুবল মহারাজ আমেরিকান, বাদবাকী সন্ন্যাসীদের কেউ ইংরেজ, কেউ ফরাসী, কেউ ওলন্দাজ। তাদেরই একজনের নাম কৃষ্ণদাস, আর একজন ধনঞ্জয়। স্কটল্যান্ডের লোক ধনঞ্জয়, আগে ছিলেন কাস্টমস অফিসার। তাঁর স্ত্রীও লন্ডন মঠের সঙ্গে যুক্ত। ধনঞ্জয়কে প্রশ্ন করলাম, কি করে হঠাৎ এরমধ্যে জড়িয়ে পড়লেন? মুহূর্তে জবাব পেলাম ঃ যেমন করে আজ আপনারা এসেছেন কৃষ্ণনাম শুনে। ধনঞ্জয় বললেন ঃ লন্ডনের রাস্তায় প্রথম যেদিন কৃষ্ণনাম শুনেছিলাম, তার সুরটি ভালো লেগেছিল। অবাক হয়ে দেখেছিলাম কৃষ্ণনামে আত্মহারা সন্ন্যাসীদের। লক্ষ্য করেছিলাম তাদের মুখ গভীর প্রশান্তি আর অনাবিল আনন্দে ভরা। তারপর থেকে সেই মুখ যতবার মনে পড়েছে ততবার আমার মন অকারণ খুশীতে ভরে উঠেছে, পরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বিশেষ কোন জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা নয়, বেদ বেদান্তের কোন গুহ্যাতিগুহ্য আলোচনা নয়। ফ্রিজেনস্টেইনের মন্দিরে ঘন্টাকয়েক চলল শুধু নাম সংকীর্তন—খোল করতাল আর তানপুরা বাজিয়ে। অবশ্য তারই মাঝে চলছিল নানা আলোচনা পশ্নোত্তর। মনে হলো বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি যে শুধু পড়া আছে তাই নয়, বিষয়বস্তু তাঁদের ধ্যানে, ধারণায় একেবারে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। কথায় কথায় কত সহজে সন্ন্যাসীর সমাধি, মায়া, গুরু, কর্ম, বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি শব্দগুলো উচ্চারণ করছিলেন এবং তাদের অর্থসঙ্গত ব্যবহারও করছিলেন।

অভিনন্দন জানাবার ভঙ্গীতে আমি সন্ন্যাসীদের বললাম— ভারতের শ্রীকৃষ্ণ এবং হিন্দুর সাধনভজন পদ্ধতি তো আপনারা খুব সুন্দরভাবে আত্মসাৎ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ধনঞ্জয় বললেন—শ্রীকৃষ্ণ ভারতের নয় জগতের। সাধনভজন পদ্ধতি হিন্দুর নয় বৈদিক। হল্যান্ডের কৃষ্ণভক্তদের প্রেমভক্তির যে আন্তরিকতা আমি দেখেছি তাতে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তারপর আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গেছি, একটা কথা আমি সবসময় মনে রেখেছিলাম, ইস্কনের লোকেদের আরো একটু বাজিয়ে দেখতে হবে, সবাই তারা অত অকপট কিনা, নীতি ও অনুশাসন একইরকম ভাবে সবাই সর্বত্র মেনে চলেন কিনা। এই মনোভাব নিয়ে আমি নিউইয়র্কে ইস্কন মন্দিরের ডরমেটরীতে ঢুকে পড়েছিলাম। মুখরোচক কোন কাহিনীর সন্ধান পাবো এই আশায়। ঐ মন্দিরে দুজন তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তারা দুজনেই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়তেন। ডরমেটারীতে ঢুকেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম, তাঁদের সামনেকার পুস্তকদানে চৈতন্য চরিতামৃত খোলা রয়েছে। পড়তে পড়তে মুখ তুলে আমাকে দেখেই তাঁরা কথা বলতে শুরু করেছিলেন। আমি বাংলার লোক শুনে দুজনেই বললেনঃ চৈতন্য চরিতামৃত থেকে গোটাকতক পৃষ্ঠা স্পষ্ট উচ্চারণে একটু যদি পড়েন আমরা উপকৃত হই। আমি কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করি, কেন ? “আমরা টেপ করে নেবো” শান্ত কণ্ঠে দুজনেই বললেন, আসলে সঠিক বাংলা উচ্চারণে আমরা যে চৈতন্য চরিতামৃত পড়তে পারছি না তা বেশ বুঝতে পারি। উচ্চারণটা একটু দুরস্ত করে নিতে চাই। টেপ বাজিয়ে কান খাড়া করে মন লাগিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই অনেক উন্নতি হবে। ওদের নিষ্ঠা দেখে আমার বিস্ময় সীমাহীন হয়ে ওঠে।

এ হচ্ছে ১৯৭২ সালে নিউইয়র্ক মন্দিরে আমার অভিজ্ঞতা। দুবছর পর ঐ মন্দিরে জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে দেখা হলে আরও একটা নতুন অভিজ্ঞতা

হলো। ফরাসী দেশের ১৯ বছরের মেয়ে আগে তার নাম ছিল জোয়েল। সোরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবজাতি বিজ্ঞান নিয়ে জোয়েল পড়াশোনা করতো এবং আর পাঁচজনের মতোই আহার নিদ্রা দেহভোগ কেন্দ্রিক খুব সাধারণ জীবন যাপনই করতো। তবু তার মনে কিছু প্রশ্ন এসেছিল। আমি কে, কেন পৃথিবীতে এলাম, কোথায় ফিরে যাব ইত্যাদি। তার জবাব কেউ দিতে পারেনি। আর ঠিক তখনই প্যারিসের রাস্তায় মুণ্ডিতমস্তক সৌম্যদর্শন ইস্কন সন্ন্যাসীদের মুখে পরম প্রশান্তি লক্ষ্য করে জোয়েল তাদের সঙ্গে কথা বলল, তাদের পরামর্শেই লন্ডনে উড়ে গিয়ে প্রভুপাদের সঙ্গে দেখা করল। প্রভুপাদ তাকে দীক্ষা দিলেন। জোয়েল হল জ্যোতির্ময়ী। প্রভুপাদ বললেন ঃ নাম কর, কৃষ্ণকথা পড়, প্রসাদ খাও। জ্যোতির্ময়ীর কাহিনী শোনার সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ব্রুকলীন, ম্যানহাটন, নিউজার্সির দূরান্ত থেকে হঠাৎ দর্শক এসে লুচি, আলুরদম, পায়েসের প্রসাদ খেয়ে লুটিয়ে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে প্রণাম করছে, আর জ্যোতির্ময়ী কার যেন অর্দ্ধভুক্ত পরিত্যক্ত প্রসাদের পাত্র কুড়িয়ে কোলের উপর রেখে পরমানন্দে খেয়ে চলেছে। কারণ জানতে চাইলে জ্যোতির্ময়ী বলে প্রসাদ ফেলতে নেই। ইস্কনের হরেকৃষ্ণ শিক্ষা চিন্তা অভ্যাস এমন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে বিশ বছর আগে থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। আমি আরও বছর পাঁচেক আগের কথা একটু বলে নিই। প্রসঙ্গতঃ ১৯৬৭ সালে সানফ্রান্সিস্কোয় রথযাত্রার কথা। ধূতি, শিখা, খোল, করতাল, উপবীত, ধূপ, নামাবলী, লুচি, পায়েস এবং মহাপ্রভু মুখের কৃষ্ণনামের সঙ্গে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উৎসবস্পৃহাটিকেও ভারত থেকে ইস্কন টেনে এনেছে। কারণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীকৃষ্ণই জগন্নাথদেব, ইস্কনীরা মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করেন।

সানফ্রান্সিস্কোয় তখন তিন টন ওজনের বিরাট রথ তৈরী হয়েছিল। ফুলমালা আর গৈরিক পতাকায় সজ্জিত আড়াই তল বিশিষ্ট সেই রথের

সর্বোচ্চ তলায় সুভদ্রা বলরামসহ জগন্নাথদেব এবং পরের তলায় মখমল জোড়া মহার্ঘ্য সিংহাসনে স্বয়ং প্রভুপাদকে বসিয়ে দশহাজার আমেরিকান ও ইউরোপীয় বৈষ্ণব ভক্ত সেই রথ টেনেছিলেন। পুরোভাগে ১০০ ফুটের ব্যবধানে চৈতন্য মহাপ্রভুর ১০ ফুট উঁচু একটি পট রেখে রথের সামনে সেদিন কৃষ্ণনামের সঙ্গে সংকীর্তনাবিষ্ট সাহেব সাধুরা যেরকম উদ্দাম নৃত্য করেছিলেন, পাশ্চাত্যে বিশেষতঃ আমেরিকার মাটিতে তা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সেকথা অনেকের কাছেই রীতিমত গবেষণার বিষয়। মনে রাখতে হবে এ হচ্ছে ইস্কন প্রতিষ্ঠার পরের বছরের ঘটনা। এবার একটু কানাডার কথা বলা যাক্— ১৯৭৪ সালে মন্ট্রীয়লের মন্দির পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল আমার। গেরুয়াধারী সাহেব সন্নাসী, শাড়ী সিঁদূর পরা, ললিতা-বিশাখা-বিষ্ণুপ্রিয়া নামধারিণী মেম সন্ন্যাসীদের দেখে আমার মনে হলো, কানাডিয়ান ভক্তদের মত মনে-প্রাণে অমন করে আর কেউ বোধহয় ধর্মাচরণ করে না—গীতা, চৈতন্য ভাগবত, বেদবেদান্ত পড়ে না। মন্দিরের কক্ষে কক্ষে রাধাকৃষ্ণ মুর্ত্তি, ঠাকুরদেবতার পট, ধ্যান-জপসঙ্কীর্তনের আয়োজন ছিল।.যথারীতি প্রসাদ-চরণামৃত সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা ছিল। মন্দিরে সন্ন্যাসী সংখ্যা তখন ষাট। পরিবেশটি এমন যেন ৫০০ বছর আগেকার চৈতন্যযুগের নবদ্বীপে তাঁরা অধিষ্ঠান করছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা শ্রীচৈতন্য তাঁদের মনের দেবতা, প্রাণের বিগ্রহ, প্রেমের ঠাকুর।

কানাডার পর অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণের মন্দিরে ১৯৭৯তে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তার তুলনা নেই— বসন্তদিনের বাংলায় তখন হোলিখেলা চলছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস বলে ভক্তরা পথে পথে কীর্তন করে চলেছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় তখন শরৎকাল। দিনগুলো সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ। সন্ধ্যেবেলায় মেলবোর্ণের মন্দিরে বেদম সংকীর্তন চলছে। শহর গ্রাম থেকে ধুতি শাড়ী পরা সাহেব মেম ভক্তরা দলে দলে তখনও আসছেন।

মন্দিরে প্রবেশের সময় গায়ে ফুল ছিটিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। মাটিতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে তাঁরা প্রণাম করছেন দেবতাকে এবং সমাগত ভক্তমন্ডলীকে—সবার উল্লাস আর উচ্ছ্বাসের শেষ নেই। মেলবোর্ণের ডাস্ক ষ্ট্রীটের মন্দিরে বিগ্রহ দেখে মনে হল, একেবারে যেন জাগ্রত ভগবান। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। গৌর নিতাইয়ের বিগ্রহ এবার যেন ডেকে কথা বলবেন। কাঁসর ঘন্টা, পুষ্পপাত্র, গন্ধ পুষ্প, গন্ধ প্রদীপ এবং মন্দির দেয়ালে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম খচিত অলঙ্করণ সংস্কৃতে উৎকীর্ণ গীতার বাণী এবং মহামন্ত্র দেখলে মনে কৃষ্ণ ভাবনা না এসেই যায় না। শ্বেতপাথরের হাতীর মাথায় স্থিত সুঅলঙ্কৃত টবে তুলসীগাছও অবাক হয়ে দেখলাম। পদ্মদল খচিত চাঁদোয়া, স্ফটিক কাঁচের ঝাড়লন্ঠন, ময়ুরময়ূরীর পাষাণ মূর্তিও হাঁ করে তাকিয়ে দেখবার মতই বটে। শ্রীখোল করতাল হারমোনিয়ামে বৈষ্ণবীয় রীতিতে ফুলের মালা পরিয়ে রাখা হয়েছে। দক্ষিণ গোলার্ধের সুদূর মেলবোর্ণে এ এক আশ্চর্য্য রকমের বৈষ্ণবীয় পীঠস্থান। দুবছর আগে প্রভুপাদ দেহ রেখেছেন, তাঁর মূর্তিও মন্দিরে নিত্যপূজিত হয়। তাঁরই আপন কৃতিত্বের জোরে আজ সারা বিশ্বে এতো মন্দির। মন্দিরে মন্দিরে এত ভক্তের আনাগোনা। প্রভুপাদের লেখা বইগুলি থেকে তখনই বছরে তিনচার কোটি টাকা আয় হচ্ছে এবং ইস্কনের প্রয়োজনে তা ব্যয় হচ্ছে। এদেশের অনেক মানুষ এখনও জানেন না, আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং স্পেনে রেডিও কৃষ্ণ সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। তার মাধ্যমে রোজ দুঘন্টার অনুষ্ঠানে কৃষ্ণ চেতনা জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে আজ নানা ফর্মে হিন্দুধর্ম এগিয়ে চলেছে।

এরা কেউ নিজেকে হিন্দু বলে কেউ বলে না। তার একটা কারণ হীনমন্যতা। অনেকেই যেমন অকারণে বাবামায়ের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আর একদল জানেই না সনাতন বৈদিক ধর্ম বা মানবধর্ম একই

বস্তু। বেদ, উপনিষদ, গীতা, এমনকি রামায়ণ, মহাভারতে পর্য্যন্ত কোথাও হিন্দু শব্দ নেই। কোন শাস্ত্রে হিন্দুর বা কোন গোষ্ঠীর কল্যাণ চাওয়া হয়নি। প্রাণীমাত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়েছে। পরিচয় দেওয়া হয়েছে আর্য্য বলে। আর্য্য মানে সভ্য, শ্রেষ্ঠ, পূজ্য ইত্যাদি। তাহলে হিন্দুশব্দ যুক্ত হলো কেন ? হিন্দু ধর্ম বলা হয় কেন ? এ বিষয়ে একটি প্রসঙ্গিক গল্প আছে। ঠিক গল্প নয় ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত যে কোন ঘিয়ের দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা থাকতো "এখানে ঘি পাওয়া যায়।" যুদ্ধের পর দেখা গেল কিছু দোকানে সাইনবোর্ড পাল্টে গেল। লেখা হলো "এখানে শুদ্ধ ঘি পাওয়া যায়"। কয়েকজন কৌতূহলী লোক গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো কি ব্যাপার ? দোকনদার এক, ঘি এক, সাইনবোর্ড পাল্টাল কেন? দোকানদার বললো আগে ঘি পাওয়া যেত তাই অন্যকিছু লিখতে হতো না, যুদ্ধের বাজারে কিছু ভেজাল ঘি এসেছে— ডালডা বনস্পতি তাকেও লোকে ঘি বলছে, আমি সেসব বেচি না। তাই শুদ্ধ ঘি লিখেছি সাইনবোর্ডে।

মানবধর্ম বা বৈদিক ধর্ম ছাড়া যখন কিছু ছিল না পৃথিবীতে তখন অন্য কোন বিশেষণের দরকার হয় নি। ডালডা বনস্পতির মত ইসলাম খৃষ্টান মতবাদ যখন এসে গেল, আর লোকে ভুল করে ওগুলোকেও ধর্ম বলতে লাগল তখন মানবধর্মের শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য হিন্দু শব্দটি যুক্ত করা হলো। হিন্দুধর্ম মানে সত্যধর্ম, মানবধর্ম, বৈদিকধর্ম, অনাদি অনন্ত। এটাই ছিল এবং এটাই থাকবে। তাই আজ নানাভাবে এই ধর্মের অগ্রগতি হচ্ছে, এটা হঠাৎ কিছু হওয়া নয়। মানবসমাজের এটাই স্বাভাবিক গতি বা পরিণতি। এই স্বাভাবিক গতিও কিন্তু একেবারে মসৃণ ভাবে এগোচ্ছে না। বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে নানাভাবে। মায়াপুরে ইস্কনের মন্দির প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রবল বাধা এসেছে। বাধা এসেছে স্থানীয় মুসলমানদের কাছ থেকে, বারবার তারা সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। ভক্তরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করেছে। তা নিয়ে অপপ্রচার

করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তাদের পিছনে আছে খৃষ্টানী চক্রান্ত। কারণ ইস্কনের কাজে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খৃষ্টানী আন্দোলন। কাজেই তাদের ক্রোধ স্বাভাবিক। কিন্তু ঈস্কন সন্ন্যাসীরা প্রকৃত বৈষ্ণব। তারা শাস্ত্রও বোঝে, অস্ত্রও বোঝে। তারা কৃষ্ণের বাঁশীও জানে, তাঁর হাতের সুদর্শন চক্রও জানে। তাই আক্রমণ থেমে গেছে ধীরে ধীরে। ১৯৭৯ সালে ২৫ মার্চ রাত ন'টায় চন্দ্রোদয় মন্দিরে ডাকাতি হয়। পঁচিশ ত্রিশজন ডাকাত পাঁচিল ডিঙিয়ে মন্দিরে ঢোকে। বোমাবৃষ্টি ক'রে শ্রীরাধার অষ্টধাতুর মূর্তি, বহু মূল্যবান গয়না, ছোট বিগ্রহ এবং রূপোর সিংহাসনটি নিয়ে চলে যায়। বোমায় কানাডার রাঘব দাস ও একাদশী দাসী গুরুতর আহত হন। মন্দির রক্ষীদলের গুলিতে বেশ কয়েকজন ডাকাত মারা যায়। প্রতিটি ডাকাতই ছিল মুসলমান। নিহত ডাকাত হরাই শেখ মরবার আগে জবানবন্দী দিয়ে যায়। সে বলে কুখ্যাত ডাকাত সর্দ্দার পূর্বস্থলীর এক্রাম শেখের নেতৃত্বে ডাকাতি পরিচালিত হয়েছিল। পুলিশের অনুমান স্থানীয় মুসলমানেরা এই ডাকাতিতে সহায়তা দিয়েছিল। এর ক'দিন পরে হেনরী ফোর্ডের নাতি যার নাম এখন— অম্বরীশ দাস কলকাতায় এলে সাংবাদিকেরা ছেঁকে ধরল। প্রশ্ন, আপনারা বৈষ্ণব, নামকীর্তন করেন, কৃষ্ণের ভক্ত, আর আপনাদের মন্দিরে এতো অস্ত্র ? আপনারা ডাকাতদের সঙ্গে লড়ে গেলেন ? আহাম্মুকেরা এদেশে সাংবাদিক হয় এখন। যেন ডাকাতদের হাতে সব তুলে দেওয়া কিংবা তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করাটাই এদের কর্তব্য ছিল। অম্বরীশ দাস উত্তর দিলেন যুতসই। বললেন আত্মরক্ষার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার সকলের আছে। আমরা প্রকৃত কৃষ্ণের ভক্ত বলেই অস্ত্র রেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়েও আত্মরক্ষা কিম্বা শত্রুদলনের জন্য সুদর্শন চক্র রাখতেন কেন ? এখন বাধা দেবার চেষ্টা হচ্ছে অন্যভাবে।

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ভক্তিচারুস্বামী সম্পাদিত "ভগবৎ দর্শন" পত্রিকায় একটি রোমহর্ষক খবর বের হয়। বাংলাদেশের "আলমিনার" নামে একটি পত্রিকায় আমীন নামে একজন লোক সম্পাদক তৌফিক আহমদকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় একটি হিন্দু সম্প্রদায় খুবই পাখ্না সৃষ্টি করেছে এর নাম "হরেকৃষ্ণ"। অতএব আমি আপনাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করছি যে ইসলামের পক্ষে এই জেহাদের ময়দানের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন এবং এদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রবন্ধের মাধ্যমে সতর্ক করুন এবং ইউরোপ আমেরিকায় এদের প্রভাব বিনষ্ট করার চেষ্টা করুন। এই আবেদনের ফলে আলমিনার সম্পাদক হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে আক্রমণ করে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী প্রচারের ফলে তিনি এতোই মর্মাহত হয়েছেন যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যেখানে যত নিন্দাবাদ পেয়েছেন তা সংগ্রহ করে এই সংখ্যাটিতে ছেপেছেন। আলমিনারের এই সংখ্যাটির একটি কপি ভক্তিচারুস্বামীকে পাঠানো হয়েছিল।

স্বামীজী সংযত ভাষায় জবাব দিলেন আলমিনার বা তাদের ধর্মকে বিন্দুমাত্র আক্রমণ না করে। সম্পাদক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আলোচনার মাধ্যমে অহেতুক সংশয়ের অবসান ঘটাতে। তার সাড়া মেলেনি। এইভাবে ছোটবড় বাধা বিপত্তি অপপ্রচার ঠেলে শাশ্বত সনাতন বৈদিক ধর্মের জয়যাত্রা চলেছে দেশে দেশে। শেষ পর্য্যন্ত যা সোভিয়েত দেশে হাজির হয়ে মধুর গম্ভীর স্বরে বলেছে,—খোল দ্বার। সোভিয়েতের কথা আগে কিছু বিবৃত হয়েছে। এবার বলা হবে একটি আশ্চর্য চরিত্রের মেয়ের কথা। বলা হবে সেই সংশয়ী এবং সেই সংশয়োত্তীর্ণ বঙ্গ সন্তানটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঃ রাশিয়াতে ইস্কনের প্রথম যুদ্ধে প্রথম সারির কৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে প্রেমাবতীর নাম করতে হয় সর্বপ্রথমে।

পূর্বাশ্রমে তার নাম ছিল কিমিলোভা হামিদোভনা ওল্‌গা। পিতা হামিদ ছিলেন একজন জ্ঞানতাপস। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। তাঁর মা বিদূষী মহিলা, পঞ্চাশ বছর আগে চীনদেশে তিনি সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাট হিসাবে কাজ করেছিলেন। হামিদের পরিবার শুধু শিক্ষিত নয় অভিজাত। তবে কিনা ঘোর নাস্তিক। মস্কোর এক বিখ্যাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ওলগার পড়াশোনা শুরু, শেষপর্ব মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ ডিগ্রী লাভ। কট্টর নাস্তিকতার মধ্যে বেড়ে উঠলেও ওলগার মনের মধ্যে ক্রমে ধর্মভাব জাগে। হিন্দুদর্শন নিয়ে তার পড়াশোনা করতে ইচ্ছে হয়। অধ্যাত্ম জ্ঞানের ভারতবর্ষ তাকে খুব টানে। সুযোগ মিলতেও দেরী হয় না। ইস্কনের কক্ষপথে ওলগা এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, শুরু হয় তার অধ্যাত্ম সাধনার পালা। তারপর একদিন বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষাও হয়। নাম হয় তার প্রেমাবতী। পথে ঘাটে যেসব বৈষ্ণব বৈষ্ণবী আমরা দেখি প্রেমাবতীরা তাদের মতো নয়। জ্ঞানে, গবেষণায়, চিন্তার, মননে অনেক এগিয়ে। অন্তরের আহ্বানেই তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে স্মরণ নিয়েছিলেন। কথা হচ্ছিল কলকাতায়। প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যে একটুখানি সময় করে নিয়েছিলেন শাঁখা সিঁদূর পড়া প্রেমাবতীদেবী দাসী। বৈষ্ণবীয় অভ্যাসে মালা ফেরাতে ফেরাতেই কথা বলছিলেন মন্দিরে ঠিক তখন পূজোর ঘন্টা বেজে উঠল।

প্রেমাবতী এবং অন্যসব ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। "আপনি মুসলমানের মেয়ে" অতি সন্তর্পণে বলি, মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাস। "এখন আমি আর মুসলীম কোথায়" আমার কথা পুরো না শুনেই আবেগের সঙ্গে প্রেমাবতী বললেন ঃ আমার যে এখন নতুন ধর্ম—প্রেমধর্ম, বিশ্বধর্ম, গিরিধারীলালই এখন আমার উপাস্য দেবতা, আমার প্রেমের ঠাকুর। একবার একুট তাকিয়ে দেখুন তো, মধুর মধুর হাসি আর রূপের ছটায় আলো করা

মুরলীধারীর দিকে হাত বাড়িয়ে প্রেমাবতী আবার বললেন ঃ আমার কৃষ্ণ কি ভালই না দেখতে। চিরযৌবনময়, চিরসুন্দর। আমি যে তার আকর্ষণ এড়াতে পারি না। রোজ সকালে উঠে চান করে তার পূজো করি, নামজপ করি। অনিমেষে তার দিকে চেয়ে থাকি। আপনি তো ঘোর নাস্তিক পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শেষ পর্য্যন্ত টানলেন কি করে? প্রেমাবতীর চমক ভাঙ্গিয়ে দিয়ে আমি প্রশ্ন করি। আসল কথা ভোগসর্বস্ব জীবনে আমার বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। মনে মনে নানা প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেবার কেউ ছিল না। মনেও তাই শান্তি ছিল না। তখন আমার এক সহপাঠী বন্ধু রুশভাষায় অনূদিত একখানা ভগবদ্গীতা আমাকে পড়তে দিল। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ভারততত্ত্ব নিয়ে সে খুব পড়াশোনা করতো।

তার দেওয়া গীতা পড়েই আমি শ্রীকৃষ্ণর কথা প্রথম জানতে পারলাম। সবকিছু বুঝতে না পারলেও গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিগুলো আমার খুব ভালো লাগলো। খুব নতুন আর আশ্চর্য্যকর মনে হলো, অমনটি তো আগে কখনও শুনিনি। শেষ পর্যন্ত প্রভুপাদের কিছু বই পড়ে মনে হলো আমার অনেক প্রশ্নের জবাব পাচ্ছি, মনেও শান্তি পাচ্ছি, বল পাচ্ছি। আর তখনই আমেরিকা থেকে সুইডেন হয়ে হরিকেশ মহারাজ এলেন মস্কোতে। কয়েকজন সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তকে দীক্ষা দিতে। তাদের সঙ্গে আমারও দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেল। মনে হলো আমি যেন নতুন জীবন লাভ করেছি। নবজীবনে দুর্লভ অনুভূতির ছোঁয়া পেয়ে আমার দেহমন যেন নিটোল প্রশান্তিতে ভরে গেল। কিমিলোভা হামিদোভ্ না ওলগা মরে জন্ম নিল কৃষ্ণানুরাগিনী প্রেমাবতী। মস্কোতে কয়েকজন কৃষ্ণভক্তের সংস্পর্শে আমি আগেই এসেছিলাম, এবার তাদের দলে ভিড়ে পড়লুম, তাদের নিয়ে গীতা, হিন্দুদর্শন, কৃষ্ণকথা প্রচারে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম সনাতন ধর্মই হচ্ছে সব মানুষের ধর্ম। কিন্তু এসব প্রচারের সুযোগ বেশীদিন

পাওয়া গেল না। শুরু হ'ল ইস্কন আন্দোলন দমনের সরকারী তৎপরতা। এবারের ইতিহাস ভক্তদের ধরপাকড় আর কারাদন্ডের ইতিহাস। দুরূহ ক্লেশের মধ্যেও কৃষ্ণভজনার ইতিহাস। আমি একটি স্পর্শকাতর প্রশ্ন রাখলাম, দীক্ষার পর আত্মীয়স্বজন বিশেষ করে মোল্লা মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে। প্রেমাবতী জবাব দিলেন, তারা ? তারা শুধু ভেংচি কাটল ভয় দেখাল। কিন্তু ডরায় কে ? আমার স্বামী ভেচেস্লাভ আমার সঙ্গে দিব্যি সহযোগিতা করতে লাগলেন। এখন তিনি মস্কোয় ইস্কন কলেজে, ইন্টেলেকচুয়াল সমাজে প্রচার করে চলেছেন। প্রেমাবতী বলতে লাগলেন, দীক্ষার পর আমার মনটা সুস্থির হয়ে এল। আমেরিকায় বিষ্ণুপাদের সঙ্গে ফোনে আমি কথা বললাম । শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে চিঠি লিখতে শুরু করলেন, ব্যস ধরা পড়ে গেলাম।

কে. জি. বি. আগেই আমার পিছু নিয়েছিল। এবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি ভগবদগীতা অনুবাদ করছ, কৃষ্ণ প্রচার করে বেড়াচ্ছ, ঠিক কিনা। এবার বলো তোমার প্রচার কেন্দ্রগুলি কোথায় ? কোথায় কখন তুমি সোভিয়েত নীতিবিরোধী ধর্ম প্রচারের কাজ করছ, সব খবর আমরা জানি। সোভিয়েত দেশে গর্ভবতী মেয়েদের জেলে দেওয়া হয় না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তির মত গুরুতর অপরাধে সে আইন ভাঙ্গা হলো। বিচার করে আমাকে চারবছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হলো। জেলকর্তারা কেউ আমার গায়ে হাত তোলেননি, তবে সহবন্দীরা আমাকে খুব পেটাই করেছিল। তার ফলেই বোধহয় পেটের মেয়েটির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। জেলের মধ্যেই সে ভূমিষ্ঠ হয়, জেলেই তার মৃত্যু ঘটে। ওরা ছিল চোর, গুন্ডা, নরঘাতিনী। অবিরাম খিস্তিখেউড় আর অশ্রাব্য গালিগালাজ করতো। ভাবুন আমি একজন বুদ্ধিজীবি, সবচেয়ে বড় কথা একজন কবি, আমি কবিতা লিখে পুরস্কার পেয়েছিলাম। আর আমার ভাগ্যে এই তস্করলভ্য লাঞ্ছনা! পৃথিবীর কেউ

কখনও ভাবতে পারেনি সোভিয়েত জেল থেকে আমরা একদিন মুক্তি পাব। কেন আমাদের জেলে ঢোকানো হয়েছিল, কারণ আমরা কৃষ্ণনাম করি। কড়া প্রহরায় আমাদের রাখা হয়েছিল, যাতে কৃষ্ণনাম মুখে আনা আর সম্ভব না হয়। সবসময়ই আমার মন কিন্তু বলত কৃষ্ণ কিছুতেই চোখ বুজে থাকবেন না। ব্যবস্থা একটা কিছু করবেনই করবেন। সব গোলমাল একদিন মিটে যাবেই। সুইডেন থেকে কীর্তিরাজপ্রভু গর্বাচভ এবং রেগনকে সবকথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাদের বৈঠক হলে আমাদের কারা মুক্তির প্রসঙ্গটিও আলোচিত হয়েছিল। অবশ্য তার আগের ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছিল।

বিশ্বের অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ আমাদের কারামুক্তির জন্য মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। একমাত্র অষ্ট্রেলিয়াতেই একলক্ষ লোক আবেদনপত্রে সই করে আমাদের কারা মুক্তি প্রার্থনা করে ছিলেন। আমার কিন্তু মনে হয় গর্ভাবস্থায় আমার কারাদন্ড হয়েছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়। আমার কন্যা ম্যারিকার জন্ম ও মৃত্যুর খবর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তেই প্রাক গর্বাচভ মস্কো বড় বিব্রত বোধ করে। কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাবার পক্ষে এ যে মস্ত মওকা তাও তারা অনুধাবন করে। জেলে জেলে অত্যাচারের মাত্রা সাময়িকভাবে কমে যায়। প্রশাসক এবং মানুষ হিসাবে গর্বাচভ খুব উদার এবং বুদ্ধিমান। তাঁর আমলেই ইস্কন বৈধ ধর্মসংঘ বলে ঘোষিত হলো। আমরাও মুক্তি পেলাম। শুদ্ধ দীক্ষিত কৃষ্ণভক্ত প্রেমাবতী তাঁর অপর দুটি মেয়ে সম্বন্ধে বললেন ঃ আমার সরস্বতী আর ব্রজা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য বোঝে। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ খেতে তাদের কি ভালই লাগে। আমিই তো রোজ রাঁধি—ভাত, ডাল, সব্জী, হালুয়া, চাপাটি, পুরী, পায়েস। রেঁধে ভোগ নিবেদন করে তবে আমরা প্রসাদ পাই। আমি বিশ্বাস করি দিনে দিনে আরও অনেক মানুষ ইস্কনে এসে যোগ দেবেন আর পৃথিবীর চেহারাটা পাল্টে যাবে। ভগবৎ সেবার মহত্তম স্বাদ সবাই একদিন লাভ

করবে। মানুষের প্রতি যারা বিশ্বাস হারায়নি, মানুষ আসলে অমৃতের পুত্র এই চিরন্তন বৈদিক সিদ্ধান্তে যাদের কিছুমাত্র আস্থা আছে তারা প্রেমাবতীর বক্তব্যে সহমত হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। ইস্কন সম্পর্কে সংশয়ী এবং সংশয়োত্তীর্ণ যে মানুষটির বক্তব্য এতক্ষণ ধরে উদ্ধৃত করেছি বিশেষ করে রাশিয়া সম্বন্ধে, তাঁর নাম—সুরেশচন্দ্র সাহা, খ্যাতিমান লেখক, পৃথিবী চষা ব্যক্তি। তাঁর লেখা "রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ" বইটি পড়লে এ বিষয়ে আরো অনেককিছু বিষয় জানার সুযোগ পাওয়া যাবে।

হিন্দুধর্মের প্রচার ব্রতে বিশ্বময় ব্যাপৃত আছেন জানা অজানা বহু মানুষ ও প্রতিষ্ঠান। আর্য্য সমাজ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিপুল পরিমাণে এই কাজ করে যাচ্ছে। এদের ত্রিমুখী কাজ করতে হয়। আত্মবিস্মৃত হিন্দুসমাজকে আত্মস্থ করা, সংগঠিত করা, জাগ্রত করা। যারা হিন্দুসমাজ থেকে একদা অন্য সমাজে চলে গিয়েছিল তাদের শুদ্ধির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা। বিদেশে বসবাসকারী হিন্দুরা যেন স্বধর্ম সংস্কৃতিতে যুক্ত থাকে তার জন্য ব্যবস্থা করা। এসব ব্যবস্থা যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চলছে তার প্রমাণ স্বদেশে এবং বিদেশে হিন্দুদের মধ্যে জেগে ওঠা চেতনা। এরপরেও এঁরা অন্য সমাজের মানুষকে নিজেদের সমাজে নিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছেন হিন্দুধর্মের বিশালত্ব, ঔদার্যপূর্ণ দর্শনের আকর্ষণে। কারণ পরীক্ষা নিরীক্ষা তুলনামূলক আলোচনা এবং বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচরণ দেখেই মানুষ আজ বুঝতে পারছে মানবসমাজের প্রশান্তির আশ্রয় কোনটি। সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া ; সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুখভাগ্ ভবেৎ— বাণীতেই প্রমাণিত হিন্দুত্ব কোন সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর বা জাতিবিশেষের জন্য নয়। শুধু মানুষের সমাজ নয়, প্রাণীমাত্রের কল্যাণ চেয়েছে হিন্দুধর্ম। সকলের জন্য সুখ সবাইকে নিরোগ কল্পনা করা, সবাইকে ভদ্ররূপে দেখা, ধনসম্পদ সকলের জন্য সমভাবে

বন্টনের কথা আর কেউ বলেনি। সবাই খৃষ্টান করতে চেয়েছে, মুসলমান বানাতে চেয়েছে। এই বিশাল বিশ্বে হিন্দুই শুধু বলেছে ঃ মর্নুভব—মানুষ হও! তর্পণ করতে গিয়ে হিন্দু তার পূর্বপুরুষ-অধস্তন পুরুষ, আপন পর, জ্ঞাত-অজ্ঞাত, শত্রু মিত্র সকল আত্মার তৃপ্তিসাধন মুক্তি প্রার্থনা করে। উপনিষদে একোহম্ বহুস্যাম—এক ছিলাম বহু হয়ে গেলাম, এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে স্থাবর জঙ্গম সবকিছুর মধ্যে এক সুগভীর অচ্ছেদ্য একাত্মতা অনুভব করে শুধু হিন্দুদর্শনে উদ্বুদ্ধ মানুষ। হিন্দুর বাইরে যারা তারা শুধু সৃষ্টি করেছে শত্রু। চালিয়ে যাচ্ছে সংঘাত। ধর্মের নামে সবাই একটি সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজেদের দম বন্ধ করে আনছে, ওই গন্ডীর বাইরে কেউ যেতে চাইলে তাকে বলছে পাপী, কাফের। তাদের জন্য কত শাস্তি, কী ভীষণ নরকের পাকা ব্যবস্থা। আর আকাশের উদার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে হিন্দুরা বলছে ঃ কেউ পাপী নয়, কেউ কাফের নয়। "শোন বিশ্বজন, অমৃতের পুত্র যত দেবগণ, দিব্যধামবাসী আমি জেনেছি। তাঁহারে, মাহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে। জ্যোতির্ময়! তারে জেনে তার পানে চাহি, মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো অন্য পথ নাহি।" তাই দেশে দেশে শাশ্বত সনাতন বৈদিক ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের জয়যাত্রা মানব সভ্যতার একটি স্বাভাবিক পরিণতি। বিকৃত জীবন থেকে উন্নততর জীবন, দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মানুষের ভবিতব্য।

প্রকাশকের কথা

দীর্ঘ পরাধীনতায় হিন্দুরা হারিয়ে ফেলেছিল স্বাভিমান, আত্মগৌরব। ডুবে গিয়েছিল হীনতা, হীনমন্যতা ও আত্মকলহে। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় সে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। জাতপাত সঙ্কীর্ণ রাজনীতির উর্ধে মানুষের মধ্যে জেগে উঠছে হিন্দুত্বের জন্য গৌরববোধ। এটা আমাদের চোখের সামনে ঘটছে দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বের দেশে দেশে হিন্দু ধর্ম দর্শন এবং সংস্কৃতি কিভাবে তার বিজয় রথকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা আমরা অনেকেই জানি না। খৃষ্টান, ইসলাম, মার্ক্সবাদের দম বন্ধ করা সঙ্কীর্ণ ভাবনা-চিন্তা মানুষের নাভিশ্বাস উঠিয়ে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রবৃত্তি ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত জীর্ণ করে দিয়েছিল পাঁচটা মহাদেশের মানুষকে। প্রকৃত মুক্তির জন্য তারা আজ অবলম্বন করেছে বিশ্বভৌমিকত্ববাদী দর্শন হিন্দুত্বকে। নানা-ভাবে তার প্রকাশ ঘটছে। ভাবতে অবাক লাগলেও এটা সত্য আজ অষ্ট্রেলিয়ায় রথযাত্রা, নিউইয়র্কে রাসলীলা; বৃটেনে বৈদিক যজ্ঞ, মস্কোয় অষ্টমপ্রহর কীর্তন, বার্লিনে অখণ্ডনামযজ্ঞ, দানিয়ুব কিম্বা টেমস নদীতে নৌকাবিলাস, টোকিওতে দোলযাত্রা নিত্য-নিয়মিত ঘটনা। বিদ্বান পণ্ডিতদের দেশে দেশে বেদান্তচর্চা দীর্ঘ দিনের বিষয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে কোথাও সাবলীলভাবে কোথাও বিচিত্রভাবে এগিয়ে চলেছে হিন্দুধর্ম। স্বল্প পরিসরে তারই বিবরণ "দেশে দেশে জয়যাত্রা"। সকলের ভালো লাগবে আর উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়াবে এ আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। এ বিশ্বাস থেকেই এই নতুন সংস্করণটি পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি।

তপন কুমার ঘোষ

শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা